International Journal of Applied Research 2020; 6(3): 69-76

International Journal of Applied Research

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(3): 69-76
www.allresearchjournal.com
Received: 07-01-2020
Accepted: 10-02-2020

সুশান্ত মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ডাঃ বি। আম্বেদকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বারুইপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Correspondence Author:
সুশান্ত মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ডাঃ বি। আম্বেদকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বারুইপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বাংলা সাহিত্যে নারী: সে যুগে ও এ যুগে

সুশান্ত মণ্ডল

Abstract
Women are the most alluring creation of our almighty god. Maybe this is the reason, women suffer much agony and anguish just like a flowing stream of a river. It is the women, who lead thir families to a vibrant, glowing future, just the way a flowing river leads to eterinty, while making the entire land fertile for cultivation of crops and cereals. Yet they are forced to live their lives within the 'Lakshmana Rekha' that refers to a strict convention, never to be broken is mentioned in the religious text 'Ramayana'.
From the very beginning of this creation, the convention is being followed. But, the 21st century have witnessed women who have undergone remarkable transformations to change themselves. In the recent times, women wearing veil (Ghomta) and vermilion (Sankhya-Sindoor) have stopped staying within closed doors and windows. The women of India are teaching themselves how to live and step out into the world of challenges. Women have shaken the conventional patriarchal societal norms by preaching the concept of 'Jorayu Sadhinata' in this new century.

Keywords: Medieval, renascence, feminism, globalization, post modernism, social media, glamour

মূল প্রবন্ধ:

"ভারতের দক্ষিণে রাজস্থানের একটি গ্রামের মেয়েরা পুরুষের জুতা ধোয়া পানি খান। ছোট্ট সেই গ্রামটির নাম ভিলওয়ারা। এখানেই আছে বাংকায়া মাতার মন্দির। এই মন্দিরে গেলেই দেখা যাবে পুরুষের জুতা মুখে নিয়ে পানি খাচ্ছেন মেয়েরা। এই মন্দিরে এটি খুব সাধারণ দৃশ্য। এখানে মেয়েরা আসেন তাদের অশুভ শক্তির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়। আর সেই মুক্তির জন্যই তারা এমনসব রীতি মানেন যা দেখার জন্যও অত্যন্ত খারাপ। শুধু জুতা ধোয়া পানি খাওয়াই নয়, তার আগে মাইলের পর মাইল সেই জুতা মাথায় করে হেঁটে মন্দিরে আসতে হয়। এর পরে প্রায় ২০০টি সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয় মন্দির সংলগ্ন পুকুরে। এর পরে জুতা ধুয়ে পানি খাওয়ার পালা। সেখানেই শেষ নয়। এর পরে ফের জুতা মুখে ও মাথায় করে নিয়ে বাড়ি ফেরা। সব কিছুই নাকি অশুভ শক্তির থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায়।"[১]

সংবাদপত্রে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এই প্রতিবেদন থেকে আজকের দিনে নারীর অবস্থানের কথা অনুমান করা যায়। এবার ফেরা যাক প্রাচীন যুগে। মনুসংহিতায় নারীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"[২]

অর্থাৎ নারীর কোনো স্বাধীনতা নেই। বিবাহের পূর্বে পিতা, যৌবনে স্বামী, আর বার্ধক্যে পুত্র তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। নারী চিরকালই উপেক্ষিত ও নির্যাতিত। কি জীবনে কি সাহিত্যে। সাহিত্য তো জীবনেরই দর্পণ। তাই আদি যুগের সাহিত্য থেকেই নারীর দুঃখের কথা ব্যক্ত হয়ে এসেছে। ২০ সংখ্যক চর্যায় তাই এক হতভাগিনী নারীর কন্ঠে উঠে এসেছে এই কথা –

“নিরাসী খমণ ভতারি। মোহের বিয়োগা কহণ ন জাই ॥
ফটিলেউ গো মাএ অন্তউড়ি চাই । জো এথু চাহাম সো এথু নাহি॥
পহিল বিআণ মোর বাসন পূড়া । নাড়ি বিআরন্তে সে ব বায়ূড়া॥
নব জৌবণ ভইলেসি পূরা । মূল নখলি বাপ সংঘারা ॥”[৩]

মধ্যযুগের নারীর কাছে –

“স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা ।
স্বামী সে পরমধন স্বামী বিনে অন্যজন
কহে নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা ।”[৪]

ফুল্লরার বারোমাস্যাতে ব্যক্ত হয়েছে এই কথা গুলি । স্বামীকে আঁকড়ে থাকতে চায় রমণী । কিন্তু তার বিনিময়ে তার প্রাপ্য কী ? স্বামীর মোহগ্রস্ততায় পরনারীকে সপত্নীরূপে আজীবন বহন ।

আধুনিক যুগে এসে নারীও 'নবজাগরণ' এর আলোকপ্রাপ্ত হয়। মধ্যযুগের অচলায়তন ভেঙে তারা প্রতিবাদ করতে শেখে । অবশ্য তাদের সহায়ক ছিলেন দুই পুরুষ - রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । এঁদের হাত ধরে তারাও আধুনিক হয়ে উঠে । আর তখনই বঙ্কিম চন্দ্রের কলমে উঠে আসে তিলোত্তমা, মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা, ইন্দিরা, রাধারাণী, চঞ্চলকুমারীর মতো নারীরা । আর রবীন্দ্রনাথের কলমে রচিত হয় –

“আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী ।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা - ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল - ফোটা ।”[৫]

আর একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারীর স্বাধীনতার সীমা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । তবে নারী কী আজ তসলিমা নাসরিন এর কথা মেনে নিল ? তসলিমা বলেন -

“নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যভিচার করতে অভ্যস্থ হোক । নারী খাদকের ভূমিকায় না এলে তার 'খাদ্য' নামের কলঙ্ক ঘুচবে না ।”[৬]

বাস্তবে নারী কী আজ খাদকের ভূমিকায় এসেছে ? এটা একটা বড় প্রশ্ন । তবে নারীর চালচলন, জীবন যাত্রার যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না । নতুন যুগে নারী আজ নিজেকে রঙীন আয়নাতে দেখতে শুরু করেছে ।

[দুই]

প্রাচীন যুগ থেকেই নারীর অবস্থান সর্বনিম্নে । হিন্দু শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী তৎকালিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের কাঠামোতে সর্বত্র সাধারণভাবে নারীকে শূদ্র এবং পশুর সঙ্গে একাসনে বসানো হয়েছে । বৈদিক যুগেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি । বৌধায়নের 'ধর্মশাস্ত্র', মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারদের রচনা'অর্থশাস্ত্র' কৌটিল্যের,, বাৎসায়নের'কামসূত্র', কালিদাসের বিভিন্ন নাটক বাণভট্টের , 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী', হর্ষবর্ধনের নাটক 'রত্নাবলী', মাঘের 'শিশুপালবধ', দন্ডির'দশকুমারচরিত', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', কলহনের প্রভৃ 'রাজতরঙ্গিণী'তি গ্রন্থ থেকে নারীর দুরাবস্থার কথা জানতে পারা যায় । পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র পুত্রের মাতা । তার কোনো স্বাধীনতা ছিল না । হর্ষবর্ধনের সময় সতীদাহ (সপ্তম শতকে) প্রথার প্রচলন ছিল । শিক্ষাদীক্ষা উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায় । তাদের বেদপাঠ নিষিদ্ধ হয় । তবে বৌদ্ধ ও জৈন পরিবারের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল । কলহন রক্ষণশীল ও নারী স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন । আবার এইযুগে লীলাবতী ও খনার মতো বিদূষী মহিলারও সাক্ষাৎ মেলে । নারী স্বাধীনতা না থাকলেও তাদের যথেষ্ঠ সন্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত । মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীদের দুঃখ বেদনার ইতিহাস এসেছে, অবশ্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র দেখা যায় ।

আধুনিক যুগের সাহিত্যে পুরাণের নারীদের মধুসূদন নবচেতনার আলোকে রূপ দান করলেন । এর পর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেই আমরা প্রথম আধুনিক নারীর অঙ্কুর দেখতে পাই। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' শৌর্যে বিক্রমে পুরুষের সমকক্ষ। সে পুরুষালী বিদ্যায় শিক্ষিত, এমনকি পুরুষের বেশে সজ্জিত। আজকের যুগ হলে চিত্রাঙ্গদাকে নির্দ্বিধায় ক্রস ড্রেসার বলা যেত।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নারীর পক্ষে যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তাই করেছে। ভালবাসার পাত্র শুধু বেছে নেওয়াই নয়, তাকে নিজের করে পেতে যেন তেন প্রকারেণ সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তাও শেষে পর্যন্ত চিত্রাঙ্গদাকে তার প্রেমিকের কাছে সহকর্মিনী হবার অনুমতি চাইতে হয় । আর শ্যামার আগ্রাসী প্রেমের পরিণতি হয়েছে ধ্বংসে। তার চেয়ে বড় কথা, এই দুই নারী চরিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্য মেয়েদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাননি বা চাননি বলেই মনে হয়। তাই এরা নহে দেবী নহে সামান্যা নারী - অনন্যা; সাধারণ মহিলাদের নাগালের বাইরে। শ্যামা চিত্রাঙ্গদার উত্তরণের সঙ্গে বাকী দশজন মেয়ের অবস্থা জড়িয়ে ফেলেন নি রবীন্দ্রনাথ।

'জীবিত ও মৃত' (১২৯৯) গল্পে কাদম্বিনী বিধবা এবং এক অদ্ভুত ঘটনার পাকে পড়ে সকলের কাছে মৃত। বস্তুত: গল্পের শেষে তাকে মরে প্রমাণ করতে হল যে সে মরে নি। নারী, বিশেষত: স্বামীসম্বল হীন বিধবার অস্তিত্ব যে কি ভাবে সমাজের প্রান্তদেশে সরিয়ে রাখা হয়েছে তারই উদাহরণ কাদম্বিনীর জীবন। কাদম্বিনীর কাতরোক্তি -

“কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কী অপরাধ করিয়াছি। আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই - ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব ।”[৭]

- এই বক্তব্য মানবিক অধিকার চ্যুত প্রত্যেকে বাঙালী নারীর কান্না। পুরুষের পরিচয় বিহীন তার স্থান যে ইহলোক পরলোক কোথাও নেই, সে কথা বাংলার মেয়েদের অজানা নয়। কাদম্বিনীও শেষে অবধি মরতে বাধ্য হয়। জেতার অবকাশ রবীন্দ্রনাথ তাকে দেন নি।

তবে এর বিকল্প আমরা পাই 'স্ত্রীর পত্রে' (১৩২১) । মৃণাল ঘরের বৌ হলে কি হবে সে কবিতা লেখে এবং সন্তান হীন। তার

প্রথম সন্তান - যে সন্ধ্যাতারার মতো ক্ষণকালের জন্যে উদয় হয়েই অস্ত গেলে - সে ছিল এক কন্যা। এহেন মৃণাল যার সংসারে খুব বেশী দাবী থাকার কথা নয়, সে নিজের ব্যক্তিত্বের দাপটে দাঁড়াবার কিছুটা মাটি কেড়ে নিয়েছিল, এবং সেখানে ঠাঁই দিয়েছিল আর একটি দুঃখী মেয়েকে। এই বিন্দুর দৌলতেই মৃণাল সমাজে মেয়েদের অবহেলার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারে। সেখানেই ঘটে তার জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন, যার ফলে সে স্বামী এবং বাড়ী, দুইই ত্যাগ করে -

"তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করি নে। আমার সমুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।"[৮]

বাংলা সাহিত্যে নারীর কথা বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের নাম করবো না, তা হয় না। তবে শরৎচন্দ্রের কোন একটি বিশেষ উপন্যাসের নাম করার প্রয়োজনও দেখি না। শরৎচন্দ্রই বোধহয় একমাত্র লেখক, যিনি বাঙালী সমাজের অবক্ষয় দেখাতে নিয়ম করে নারীর সামাজিক পরিস্থিতির অবতারণা করেছেন। তাঁর মানস কন্যারা সমাজের নানান স্তর থেকে এসেছে বটে, কিন্তু সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হিসেবে তিনি উপস্থিত করেছেন নিম্নমধ্য ও মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের। এই মাঝের তলায় বাইরের ঠাটবাট, আচার আচরণ এবং পুরুষ প্রাধান্যের আপাত শৃঙ্খলাটা টিকিয়ে রাখতে নিয়মিত বলি হয় মেয়েরা। শরৎচন্দ্রের লেখায় এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবী সুস্পষ্ট। কিন্তু তা বলে শরৎবাবু সমাজের প্রতি পুরোপুরি জেহাদ ঘোষণা করেন নি। শুধু কিছু ক্ষমতা লোভী অনুশাসকের বিকৃতির প্রতিবাদ করেছেন এবং সেই সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন যৌথ পরিবার, বিবাহ, ইত্যাদি চিরাচরিত প্রথাগুলিকে। এ সবের মধ্যে নারী নির্যাতনের বীজ তিনি দেখতে পান নি।

নারীর কথা বলতে গিয়ে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লেখেন- "মনি-মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না, তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশি নয়, কারণ, সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্যা নহেন। জল জিনিসটা নিত্য-প্রয়োজনীয়, অথচ ইহার দাম নাই। কিন্তু যদি কখন ঐটির একান্ত অভাব হয়, তখন রাজাধিরাজও বোধ করি একফোঁটার জন্য মুকুটের শ্রেষ্ঠ রত্নটি খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন না। তেমনি - ঈশ্বর না করুন, যদি কোনদিন সংসারে নারী বিরল হইয়া উঠেন, সেই দিনই ইঁহারা যথার্থ মূল্য কত, সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে - আজ নহে।"[৯]

এই পর্যন্ত যে সব লেখকের উল্লেখ করেছি তাঁরা ছাড়াও নারীর সামাজিক অবস্থা নিয়ে লিখেছেন আরও অনেকে। ঐতিহাসিক সূত্র দেখলে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে কল্লোল যুগ অবধি নারী কেন্দ্রিক যত রচনাই হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকদের নারীর অপাংক্তেয় অবস্থা সম্পর্কে সংবেদনশীল করে তোলা। এর পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল সমাজ সংস্কার। ফলে এই সব লেখায় স্থান পেয়েছে উচ্চ, ও কমপক্ষে মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলারা এবং তাদের জীবন বৃত্তান্ত। অনেক লেখকই জোর দিয়েছেন পুরুষ শাসনের ফলে নারীর মানসিক নির্যাতন ও ক্ষয়ের ওপর। ষাট দশক অবধি বাংলা সাহিত্যে এই হাওয়াই বয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে যাঁরা নারীর অন্তরের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম আশাপূর্ণা দেবী। তাঁর বিখ্যাত ট্রিলজি, প্রথম প্রতিশ্রুতি (১৯৬৫), সুবর্ণলতা (১৯৬৭), ও বকুল কথা (১৯৭৪)। মোটামুটি ভাবে আশাপূর্ণা দেবীর সব লেখাই নারী কেন্দ্রিক। মধ্যবিত্ত মহিলাদের জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী এবং সেই সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ নিয়ে তাঁর বেশীর ভাগ গল্প। তা বলে আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিটি লেখাকে নারীবাদী বলা চলে না। এ সবের মধ্যে চলতি সমাজ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার সেরকম ইঙ্গিত আমরা কোথাও পাই না। তবে প্রথম প্রতিশ্রুতি ও সুবর্ণলতা একেবারেই দলছুট। এই দুটি উপন্যাসে, বিশেষত প্রথম প্রতিশ্রুতিতে আশাপূর্ণা দেবী সত্যিকারের নারীবাদী হয়ে উঠেছেন। পুরুষ শাসনের প্রতি তাঁর ক্রোধ এবং ধিক্কার অসহায় বা নিরুচ্চারিত নয়। সত্যবতীর মাধ্যমে এই সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামো, বিবাহ প্রথা ও নারী পুরুষের সম্পর্ক, তিনি অবলীলায় অস্বীকার করেছেন। আবার সুবর্ণের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই প্রত্যাখ্যানের পথ কতটা জটিল হতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে নারীকে বেঁধে রেখেছে। এই যুদ্ধে জিততে হলে সাহস এবং কৌশল দুইই চাই। কিন্তু আশ্চর্য বকুল কথাতে গিয়ে এই লেখিকাই রক্ষণশীল হয়ে উঠেছেন। আধুনিক নারীর মধ্যে সামাজিক অধিকার জিতে নেবার পরে শুধু উছৃলতাই দেখেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী হিন্দু ধর্মের নিম্ন জাত দলিতদের অধিকার নিয়ে লেখালেখি করেন। দ্রৌপদী যখন স্বেচ্ছায় নগ্ন হয়ে সেনানিকের সামনে আসে তখন সেনানায়ক নগ্ন শরীর দেখে প্রলুব্ধ হয় না বরং ভয় পায়-

"দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষন ভয়।"[১০]

সুচিত্রা ভট্টাচার্য্য এর 'এখন হৃদয়' দুই প্রজন্মের জীবনবোধের ব্যবধানের গল্প। ঠাকুমা বিজয়া আর নাতনি রুমির। বিজয়া তার দাম্পত্য জীবন সুখ-দুঃখ-কলহ মিলিয়ে যাপন করেছেন। স্বামী বিচ্ছেদের কথা ভাবতেই পারতো না। আর তার নাতনি ভালোবেসে বিয়ে করলো কৌশিককে। কত ভাব-ভালোবাসা দুজনের। কিন্তু বিজয়া হঠাৎ করে শোনে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পথে। রুমির অভিব্যক্তিতে সেই চরম দুঃখের চিহ্নও তিনি খুঁজে পান না। বরং নাতনি তাকে বলে, "একটা সম্পর্ক তৈরি হয় উচিত ছিল, হতে হতেও হল না, ব্যস্ ফিনিশ। এর জন্য বিছানায় শুয়ে সাত দিন গড়াগড়ি দেবে কোন দুঃখে।"[১১]

বিজয়া রুমির বিচ্ছেদের কারণ জেনে আরও অবাক হন এই মনে করে, যে অপরাধে কৌশিককে ত্যাগ করছে রুমি, তার স্বামী তো চিরদিনই সেই অপরাধের অপরাধী। বিজয়ার মনে হয়, "স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই যদি এত ঠুনকো হয়, তাহলে আর রইলটা কী।"[১২] অনুভূতিহীন, আত্মাভিমানী এই নতুন প্রজন্মকে দেখে যখন তিনি বিস্মিত, তখনই অন্ধকার ঘরের একলা কোণে লুকিয়ে রুমিকে চোখের জল ফেলতে দেখে আশ্বস্ত হন বিজয়া। "বুকটা চিনচিন করছিল বিজয়ার। আবার যেন কেটেও যাচ্ছিল ভেতরের ভ্যাপসা ভাবটা। হে ঈশ্বর, চোখ করকর করার জন্য ওই বালিটুকু যেন পৃথিবীতে থাকে চিরকাল।"[১৩]

[তিন]

তসলিমার সাহিত্যে মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার যে লড়াই, তাতে অধিকাংশ সময়েই পুরুষ মাত্রই বিরুদ্ধ পক্ষ। সমস্ত রকম

ভাবে পুরুষের সাহায্য বাদ দিয়ে নারী নিজের পরিচয়ে বাঁচতে চায় । তাঁর 'অপরপক্ষ' নামক রচনাটিতে দেখবো সাবের হুমায়ুন কিংবা পাশার মতো পুরুষের দ্বারা যমুনা কখনো নির্যাতিত কখনো ব্যবহৃত । শেষে পর্যন্ত সে যখন পাশার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, তখন পাশাকে সে সন্তানের পিতৃত্বের গৌরব দিতে সে নারাজ । পাশাও অবশ্য যমুনা বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার পর থেকে যমুনাকে ত্যাগ করেছে। যমুনার স্বামী হুমায়ুন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, যমুনার সন্তান তার নয় । ফলে শেষে পর্যন্ত সে সন্তান শুধু যমুনার সন্তান। যমুনা বলে -

“বাড়িওয়ালার বউ এসেছিল গতরাতে, চোখ কপালে তুলে বলল আপনার সাহেব তো কি সব বলছে, বাচ্চা নাকি তার নয় ? আমি অফিসের কাগজপত্রে ডুবে ছিলাম, চোখ তুলে বললাম, বাচ্চা আমার, আমার বলেই হয়তো ওর পছন্দ হচ্ছে না, রুবি আপা । কোনও কিছুতেই তো মেয়েরা আমার বলে জানে না । আমি না হয় জানলাম ।”[১৪]

নারী পুরুষের লড়াই ও জয় পরাজয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তসলিমার যে লেখাটি সবার আগে মনে পড়ে সেটা হল 'শোধ' । বিয়ের দেড়মাসের মধ্যে যখন ঝুমুর গর্ভবতী হয়, তখন স্বামী হারুনের সন্দেহ হয় এ সন্তান তারই কিনা । সে ঝুমুর কে গর্ভপাতে বাধ্য করে । তার কিছুদিন পর হারুন বলে এবার তাদের একটা বাচ্চা দরকার। ঝুমুর মনে মনে বলে এবার 'আমাদের' দরকার । 'সেবার আমাদের ছিল না' । প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে ঝুমুরের মনে। বাড়ির নিচের তলার ভাড়াটে এক ডাক্তার সেবতির কাছে সে জানে কখন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক হলে সন্তান হতে পারে । ইতিমধ্যে ঝুমুরের দেওর অ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় । সেই অবকাশে ঝুমুর দুপুর বেলায় সেবতির দেওর আফজলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে । ক্রমশ সন্তান আসন্ন হয় । ঝুমুরের মনে চলে নানা দ্বন্দ্ব -

“ আমি ছেলে, মেয়ে কিছুই চাই না, এ সন্তান আসলে আমার কাঙ্ক্ষিত সন্তান নয় । এ আমার প্রতিবাদের, প্রতিশোধের সন্তান । এ আমার স্বপ্নের ভ্রূণ নয় । এ আমার ক্ষোভের, যন্ত্রণার ভ্রূণ । ”[১৫]

ঝুমুর এর পর এক সন্তানের জন্ম দেয় । হারুনের নয় আফজলের । ঝুমুরের কথায় - “ প্রসবকক্ষে ভীষণ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে যেতে আমি এক পুত্র সন্তান জন্ম দিই । হারুন লুফে নেয় । আমার সন্তানকে, আমার ও আফজলের সন্তানকে ও কাপড়ে মুড়ে বুকের কাছে জড়িয়ে রাখে । দেখে আমার বড় আনন্দ হয় । সত্যি বলছি, বড় আনন্দ হয় । তৃপ্তিতে আমি দুচোখ মুছি। ”[১৬]

এই ভাবে ঝুমুর হারুনের সন্দেহের তীব্র জবাব দেয়। নিজের সন্তানকে হারুন সন্দেহ করেছিল। তার পরিবর্তে যাকে সন্তান জেনে সে গর্বিত পিতা হয়ে উঠেছে, সে তার সন্তান নয় । ঝুমুর সে সত্য প্রকাশ করতে চায় না । কারণ হারুনের এই ভ্রান্ত পিতা হওয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের আনন্দ খুঁজে পায় ।

তসলিমা নাসরিনের 'ভ্রমর কইও গিয়া' গল্পে আমরা দেখি হীরার স্বামী আলতাফ যৌন অক্ষম পুরুষ । যে যৌনতৃষ্ণা জাগাতে পারে, কিন্তু সে তৃষ্ণা নিবারণ করবার ক্ষমতা তার নেই। অথচ সে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে না । সব দোষ হীরার ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। ফলে নানান লাঞ্ছনা, নানান নির্যাতন সহ্য করতে করতে এক সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাপের বাড়িতেও তার জায়গা হয় না। শেষে পর্যন্ত সে একটা চাকরি খুঁজে নেয়, আর খুঁজে নেয় কায়সারকে । যে তাকে দেয় পূর্ণতার আস্বাদ -

“আমার শরীর কতকাল কিছু যেন চেয়েছিল, খরার জীবনে জল চেয়েছি সামান্য, আর হঠাৎ না চাইতেই অবাধ বর্ষণ জোটে সুখের । পিপাসা মিটেছে আমার । এই শরীর পিপাসা । ঊষর জমি জুড়ে জলপতনের শব্দ, ফসলের সবুজ দোলা, আমি হারাই অন্য এক অচেনা জগতে । কি ঘটে আমার শরীরে বুঝি না, পিপাসা কেন মিটছে তাও বুঝি না, পিপাসা যখন মিটছে আমি কায়সারের পিঠ আঁকড়ে ধরি প্রচণ্ড সুখে, শীর্ষসুখ; ওর পিঠে আমার দশ নখের দাগ বসে যায় ।”[১৭]

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায়, 'নির্বাচিত কলাম 'এর একটি অংশ। যেখানে তিনি লিখেছেন -

“নারী একবার নিজেকেই নিজের সহায় বলে জানুক । যদি জাল ছিঁড়তে হয়, নারী জাল ছিঁড়ুক । যদি বদ্ধঘরের খিল ভেঙে টুকরো করতে হয়, নারী তাই করুক । লোকে তাকে থুতু দেবে, লোকে তাকে চরিত্রহীন বলে গাল দেবে । তাতে কী ? লোকের কথায় কী এসে যায় ! এই লোকের মুখেই থুতু দেবার অভ্যেস করুক নারী । এই লোকের মুখেই চুনকালি মাখবার অভ্যেস করুক নারী ।”[১৮]

তসলিমা নাসরিনের নায়িকাদের প্রধান লড়াই পুরুষদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি লড়াই নারীকে বুঝতে পুরুষের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে । তাই তাঁর লেখায় কেবল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জয় নয়, নারীর অনুভূতির প্রতিষ্ঠা তসলিমার একটি বিশেষ লক্ষ্য ।

তসলিমার 'নিমন্ত্রণ' গল্পে আছে পুরুষের দ্বারা নারী নির্যাতনের কাহিনি । গল্পের আমরা দেখি মনসুর শীলার স্বপ্নের পুরুষ । তার সঙ্গে সে যোগাযোগের নানান চেষ্টা করে । একদিন মনসুরের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় । মনসুর তাকে নিমন্ত্রণ করে । কিন্তু শীলার অভিসার সুখের হয় না । মনসুর আর তার বন্ধুরা মিলে তাকে ধর্ষণ করে । ফলে শীলার সব স্বপ্ন ভেঙে যায়। 'নির্বাচিত কলাম' এ তিনি লিখেছেন - “ ফুল ও ফলের সঙ্গে নারী অঙ্গের তুলনা চলে । ফুল ও ফলের আয়ু খুব অল্প, ঘ্রাণ নিলে, খেলে ফুল ও ফল দুটোই আবর্জনার ঝুড়িতে চলে যায়, একই রকম নারীও । নারীকেও খেয়েদেয়ে এঁটো-কাঁটার মতই ফেলে দেওয়া হয় । ”[১৯]

[চার]

এক নারী কবি সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় এর কলমে নারী চরিত্র আমাদের শোনায় –

“পায়ের পাতায়, বুকে, বিঁধে নেব কাটা ও পুরুষ
আমরাই রাক্ষুসি হব, সৎমা হব, গড়ে তুলব ডাইনি গোপনগান

পুরুষের তৈরি করা ডাইনি সৎমা, রাক্ষুসী, এই সব ধারণার মূলে সজোরে আঘাত করলেন কবি সংযুক্তা।"[২০]

বর্ণা অধিকারীর 'সে আমায় বুঝল না' কবিতায় উঠে এসেছে নারীকে পুরুষের না বোঝার কথা –

" সে আমায় বুঝল না
বুক ভর্তি দহন নিয়ে ছুটে গেল বসন্ত
কিন্তু বসন্তের কোকিল হতে পারল না
আমি বৃষ্টি হতে চেয়েছিলাম
কিন্তু কেউ শ্রাবণের ধারায়
আমাকে ভাসাতে পারল না।"[২১]

নতুন শতাব্দীতে নারী যেন নিজেকেই চিনতে পারছে না, নিজের কাছেই যেন সে অচেনা দেবীস্মিতার কবিতাতে এই দিকটিই উঠে এসেছে –

"এ কোন আমি এ কোন সজ্জা
এ কোন নতুন রূপ
নিজের কাছে নিজেই অচেনা
হয়ে গেছি নিশ্চুপ।"[২২]

নতুন শতাব্দীতে এসে মানুষ সম্পর্ক হীনতায় ভুগছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক ছিল সেটা যেন ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই মানুষ আজ একা। তার কোন গৃহ যেন আজ আর নেই। তাই কৃষ্ণা বসু তাঁর " আকৃতি" কবিতায় লিখেছেন –

"দীর্ঘ পথ হেঁটে আসছি, বাড়ি যাবো, বাড়ি।
বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায়? বিভেদে আড়া আড়ি।"[২৩]

পায়েল ব্যানার্জীর " রাতের মাঝে আমি একা" কবিতায় একই চিত্র ধরা পড়ে –

"একা চলেছি আমি শহরের পথে
কি এক ঈশারা যেন টেনেছিল আমাকে।
নির্জনে অনুভব করি মনুমেন্টে মিনারের চূড়া,
আর দেখি আলোয় আলোয় ভরা ব্যস্ত কলকাতা,
চোখ যায় আকাশের উজ্জ্বল তারায়।
রাতের ভিতরে হেঁটেছি আমি শহরের প্রান্তে
আজও পারিনি শহরের ব্যস্ততাকে জানতে।"[২৪]

[পাঁচ]

বিশ্বায়ন উত্তর যুগে এসে দেখি সম্পর্কের যেন কোন মূল্য নেই। ভারতবর্ষ স্বামী - স্ত্রীর যে মধুর সম্পর্ক নিয়ে গর্ব করতো সেই সম্পর্ক আর নেই। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'মনের চোখ' (২০১৩) গল্পে সম্পর্ক হীনতার চরম নিদর্শন আমরা পাই। গল্পে হেমন্ত সেই সম্পর্কের রঙীন মায়াতে আবদ্ধ।

"বিয়ে করার মজাই বা ক'দিন ছিল হেমন্তর? ফুলশয্যার পর বোধহয় ছ'মাসও নয়। মানসী যেই টের পেল পেটে বাচ্চা এসেছে, অমনি তো সে আগুনের খাপরা। দিবারাত্রি তার কী গজগজানি।"[২৫]

এই গজগজানিতেও হেমন্তের একটি ছেলে বাবাই, আর মেয়ে টুম্পা সংসারে এলো।

বাবাইয়ের বিয়ের কাহিনি -

" বাবাইয়ের ব্যাপারটা অবশ্য একটু অন্য রকম ঘটেছে। হেমন্তই পছন্দ করেছিল তৃণাকে। সাধ্যমতো ঘটা করেই দিয়েছিল বিয়েটা। তা সেই সাধ করে আনা ছেলের বউ যে অষ্টমঙ্গলার পর বাপের বাড়ি থেকে আর ফিরবেই না, কে জানত! কী কেস? না, বাবাইকে নাকি তার মনে ধরেনি। বেচারা বাবাই গুমরে গুমরে কেমন যেন হয়ে গেল।"[২৬]

আর মেয়ে টুম্পার কাহিনি -

"মেয়ে তো আমার বর শ্বশুর শাশুড়ি নিয়ে ভালই সংসার করছিল। ভারী সুন্দর একটা মেয়েও হয়েছে। তারপর স্বামী - স্ত্রীতে কী অশান্তি। দুম করে চলে এল। "[২৭]

এ যুগে সবচেয়ে জনপ্রিয় শব্দ বুঝি 'ব্রেকআপ'। প্রেমের থেকে এখন 'ব্রেকআপ' শব্দটিকেই বেশি শোনা যাচ্ছে। তাই প্রশ্ন জাগে ভালোবাসার মূল্য কতটা? কারণে, অকারণে কিংবা সামান্য কোনো কারণে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যে ভালোবাসা তা কি আজ আর নেই? অভিনন্দন সরকারের 'অপেক্ষা' (২০১৭) গল্পে আমরা এমনই চরিত্র পাই। যেখানে অগ্নি একটা বহু জাতিক বিমা সংস্থায় চাকরি করে। সেখানে চাকরি করতে আসে অদিতি ব্যানার্জি। প্রথম দর্শনেই অগ্নি অদিতির প্রেমে পড়ে যায়। অদিতিও অগ্নির প্রেমে সাড়া দেয়। ফলে চলে তাদের প্রেমলীলা। কিন্তু এক দিন অদিতি জানতে পারে টাকার লোভে অগ্নি তাদের কম্পানির 'টোটাল ক্লায়েন্ট বেসে' একটা চিট ফান্ড এজেন্সিকে সাপ্লাই করেছে। তখন অদিতি বলে -

"ইটস অল ওভার বিটউইন আস অগ্নিভ, আমার সঙ্গে কোনওদিন আর যোগাযোগের চেষ্টা কোরো না।"[২৮]

এই কথার মধ্যেই কি সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়? অগ্নি সেটা মানতে পারে না। সে অদিতির জন্য অপেক্ষা করে থাকে - " এক আকাশ নিঝুম রাত আর বুক জোড়া আশা নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অদিতি ফিরে আসবে বলে।"[২৯]

দিন দিন বেড়ে চলেছে অবাধে সম্পর্কের মায়াজাল। বিশ্বজিৎ কর্মকারের 'ঢেঁকি' (২০১৫) গল্পে আমরা পাই সেই চরিত্র। শিখা বিমলকে বিয়ে করে তার বাহু বন্ধনে সব কিন্তু মেলে ধরতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার স্বামী তার নয়। শিখা জানতে পারে তার স্বামী নিজের বৌদিকে সব কিছু দিয়েছে, শরীর, মন। তাই এক সময় সে প্রতিবাদ করে। ঢেঁকি দিয়ে চাল গুঁড়োতে গুঁড়োতে অনিতার হাত দুটিকে গুঁড়িয়ে দেয়। গল্পকারের বর্ণনায় ধরা পরেছে সেই চিত্র -

“ঢেঁকির মোনাই নিমেষের মধ্যে অনিতার হাত গুঁড়িয়ে দিয়ে, চালের গুঁড়োর মধ্যে মিশিয়ে দেয়। ভয়ানক, বীভৎস, চিৎকার করে ওঠে অনিতা। একটা হাত বাঁচাতে আরেকটি হাত দেয় নোটের মধ্যে। শিখা পূর্ণগতিতে, সম্পূর্ণ শক্তিতে ঢেঁকি পাড় দিতে থাকে। অনিতার হাত দুটো থেঁতলে যেতে থাকে, রক্তে সাদা চালের গুঁড়ো লাল হয়ে যেতে থাকে।“৩০

এই যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষও যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। মানুষের চাওয়া পাওয়ার যেন শেষ নেই। একটার পর একটা চেয়েই চলেছে। টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন। আরও কতো কি। এর জন্য নিজের সব কিছু বিসর্জন দিতেও কোন দ্বিধা নেই।

সুকুমার রুজ তাঁর 'আগ্রাসন' (২০১৫) গল্পে এই দিকটি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পে তনিমার নতুন টিভি কেনা কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক মর্মান্তিক কাহিনি। তনিমার স্বামী অতনু সামান্য মাইনের চাকুরে। তার সামার্থ ছাড়াও তার স্ত্রীর অনুরোধে ই. এম. আই. তে একটা কালার টিভি কেনে। ই. এম. আই.এর টাকা দেওয়ার জন্য তনিমা যখন 'সিটিভিশন' এর মালিক অহিন নাগের দোকানে যায়। সেখানে নতুন ওয়াশিং মেশিন দেখে লোভে নিজের ইজ্জত বিক্রি করে তা বাড়িতে নিয়ে আসে। অতনু বাড়িতে ফিরে বন্ধু তিলকের কথা ভাবে -

“এখন ওই মেশিনে সবকিছু ওয়াশ করে নিতে পারবি।”৩১

এই ভাবে মানুষ 'virturl reality' তে পড়ে সব কিছু যেন হারিয়ে ফেলেছে। এ যুগে প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, মায়া নেই, মমতা নেই। সবাই স্বার্থপর হয়ে নিজের জগতে ছুটে চলেছে ইঁদুর দৌড় এর মতো। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে তারই চিত্র উঠে আসছে।

[ছয়]

উত্তর বিশ্বায়নের যুগে এসে নারী যে অর্থে স্বাধীনতা ভোগ করে তার কোন সীমা নেই। অতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে। তারা যশ এবং অর্থের জন্য নিজের সন্তান এবং পরিবারকেও তুচ্ছ মনে করে। আলোর ঝলকানীর যুগে তারা নিজেকে রঙীন কাঁচে দেখতে শুরু করে। বর্তমানে টিভি, সংবাদ পত্রে, বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় নারীর যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়, সেই স্বাধীনতার সীমাটাইবা কতদূর আমারা জানি না। এই করণেই আজকের যুগে নারী শাঁখা, সিঁদুরের মূল্যই বোঝে না। তারা বিদেশী সংস্কৃতি কে অনুকরণ করতে গিয়ে 'লিভ ইন' এ বেশি বিশ্বাস করছে। বর্তমান দিনে তাই ভালোবাসা মানে 'বইয়ের পোকা'। আজ একটা বই কাটা কাল অন্য একটা নতুন বই কাটা।

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মরিয়ম মেয়েরা' (২০১৬) উপন্যাসে আমরা এমনই একটা চরিত্র পাই। যেখানে আমরা দেখি কলেজের অধ্যাপক ভ্রমণ এবং তার স্বামী বিবিকের আপত সুখী জীবনের মধ্যে একদিন হঠাৎই আগমন ঘটে কবি রঙ্গনের। ভ্রমণ এড়াতে পারে না রঙ্গনের প্রতি এক অমোঘ টান। রঙ্গনের কবি হিসাবে জনপ্রিয়তা ভ্রমণ কে রঙ্গন মধুতে বসতে বাধ্য করে। তাই সে অকপটেই ভাবে -

“আপনাকে কোথাও যেতে দেব না রঙ্গন। আপনি আমার কাছেই থাকবেন।”৩২

রঙ্গনের কবি প্রতিভা, যশ, অর্থের কাছে নিজের ছেলে রিম্বিক, স্বামী বিবিকে, পরিবার সব কিছুই মূল্যহীন হয়ে ওঠে।

“রঙ্গনের সঙ্গে আমার একটা খোলাখুলি প্রেমে শুরু হয়ে গেল রঙ্গন আমাদের বাড়ি থাকতে আসার মাত্র মাসখানেকের মধ্যে। প্রথম - প্রথম আমিও কিছুটা, রঙ্গন ও কিছুটা এবং মা, দাদা তো অবশ্যই ভাবছিল বেশ হয়েছে। খুনসুটি, ঠাট্টা, ইয়ারকি, একটু ঠেলাঠেলি, একটু গায়ে পড়া, একটু মান - অভিমান, আসল ঝগড়া, নকল নালিশ এসব তো হচ্ছিলই। সেই সঙ্গে রঙ্গন আর আমাদের ছাদে যাওয়া ওর ঘরে বসে অনেক রাত অবধি গান শোনা, ওর লেখা কপি করে দেওয়া, সেসব ও ক্রমে ক্রমে আমাদের সবার জন্যই খুব স্বাভাবিক হয়ে গেল। তারপর শুরু হল রঙ্গনকে আমার এটা কিনে দেওয়া, ওটা কিনে দেওয়া। শার্ট, পোলো, জ্যাকেট, কুর্তা, পাজামা, পারফিউম, শেভিং সেট এসব তো বলারই নয়। একটা সোনির মিউজিক সিস্টেম কিনে দিলাম দুম করে যখন, তখন বিবিকে বলল - 'তুমি এটা কী করছ ? একটা সীমা থাকা উচিত।'

আমি বললাম, ' তুমি এত মিন আমি জানতাম না। কী হয়েছে দিলে ? জানো, ওর কেউ নেই ?'

'ওর কেউ নেই। ওর কেউ নেই। অনেক দিন ধরে শুনছি। তোমার রোজগারের টাকায় আমি হাত দিই না। তুমি যা খুশি খরচ করো। বারণ করব না। কিন্তু মামুলি ইতিহাসের অধ্যাপক বলে তুমি আমাকে যেমন ইচ্ছে চালাবে, যা ইচ্ছে বোঝাবে, সে তো হবে না। অনেক হয়েছে, চলো, নিউ আলিপুর চলো। বাচ্চার জন্য সব ব্যবস্থা আমি করব।'

বিবিকে এই বলে আমাকে হাতটা ধরে তুলে দিয়েছিল। হ্যাঁ, আমার একটু লেগেছিল। আমি উইমেন স্টাডিজ পড়েছি। আমি স্বাধীনতাচেতা। জন্ম থেকে আমাকে মেয়ে বলে কেউ অবজ্ঞা করেনি। কোনও দিন মাছের পিস ছোট দেয়নি কেউ পাতে। “৩৩

“ আমি মনে করি না বিয়ে করলেই টেকাতে হবে। বাচ্চা হয়ে গেল বাচ্চার স্বার্থে ঝুলে থাকতে হবে। নিজে রোজগার করো। বাড়ি আছে। রঙ্গনকে ভালো লাগছে। রঙ্গনের সঙ্গে ট্রাই করো। বিবিকেকে বিদায় করো।”৩৪

বিবিকেকে বিদায় করতে লাগলো না। বিবিকে নিজে থেকেই সরে যায়। ভ্রমণ শুধু রঙ্গনের পরিচয়ে পরিচিতি পেতে চায়। কারণ -

“রঙ্গন মানে নাম, খ্যাতি, গুরুত্ব, অ্যাটেনশন। রঙ্গন মানে আলো, ফ্ল্যাশগান, সংবর্ধনা, টিভি, ইন্টারভিউ, আসুন আসুন। রঙ্গন মানে পুরস্কার, দু'হাজার দশ হাজার লোকের সামনে এক কবি, এক দার্শনিক, সেরা বাঙালি। রঙ্গন মানে মাঝরাতে অমিতাভ বচ্চনের মতো কারও ফোন। রঙ্গন মানে সেই জীবন আমারও।”৩৫

ভ্রমণ রঙ্গন লীলায় এতটাই মেতে ওঠে যে সে ভুলে যায় কি তার পরিচয়। তার শিক্ষা - দীক্ষা, প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃতি সব ভুলে যায়। সে ভুলে যায় সে একজন অধ্যাপক, একজন অধ্যাপকের স্ত্রী, ভুলে যায় সে একজন মা। ফলে ঘনিয়ে আসে তাদের জীবনের সেই মুহূর্তে -

"কলেজ থেকে ফিরে চা খাচ্ছি। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। কটা মোমবাতি জ্বাললাম। বেশ সুন্দর লাগছিল বসার ঘরটা দেখতে। ভাবছি কখন আলো আসবে, এমন সময় রঙ্গন ফিরল। আলো - আঁধারিতে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হল যে আমি রঙ্গনকে টি পট থেকে চা ঢেলে দিয়ে খুব কাছ ঘেঁষে বসলাম সোফায়। তারপর আমিই চুমু খেতে শুরু করলাম ওকে। আমার স্বামী আমার ঘর আমার আলো আর অন্ধকারে নিভৃতি, আমি চুমু খাব না তো কে খাবে ? কিন্তু আমি তখনও বুঝিনি এই হিসাবটা কোনওদিন সত্যি ছিল না। রঙ্গন প্রথমে উৎসাহ দেখাচ্ছিল না। তারপর ওর নিশ্বাস গরম হয়ে উঠল। ও আমাকে টেনে নিল মাটিতে পাতা গদির উপর। রঙ্গনের আদর একটা প্রলয়। ভরা মেহেফিলে শেষ রাতের শেষ বাদনের শেষ পাঁচ মিনিটের ঝালা - ঝড়, যায় পর তার ছিঁড়ে ছিটকে যাবে। সেই মিলন শেষ হতেই কারেন্ট এসে গেল।"৩৬

এই অবৈধ প্রেমে, অবৈধ যৌনলীলা, আর কতদিন ভালো লাগবে ? এদিকে ভ্রমণ একদিন জানতে পারে বিবেকের ক্যানসার। তার সমস্ত সম্পত্তি তার নামে লিখে দিয়েছে। তখন তার অনুশোচনা হয়। অপর দিকে -

" রঙ্গন মুখার্জীর প্রেমের কবিতায় আর সেই দম নেই। প্যাশনটা নেই।"৩৭

তখন ভ্রমণ নিজের অস্তিত্ব কে খোঁজার চেষ্টা করে। অনুভব করে, তাকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে। তখন এক ঘূর্নাবর্ত যেন গ্রাস করে তাকে। শেষে মুহূর্তে নিজের কাছে হেরে যায় ভ্রমণ।

নতুন শতাব্দীতে প্রতিহিংসা বেড়েছে অনেক বেশি। যার কারণে খুনের মতো ঘটনা এখন আর অস্বাভাবিক নয়। প্রচেত গুপ্তের 'একটি সহজ খুনের গল্প' (২০১৭) তে গল্পকার এই দিকটি দেখাতে চেয়েছেন। তৃষা সুন্দরী মেয়ে কারণ - " বন্ধুরা বলত, 'ছেলেদের চোখ না পড়ে উপায় নেই।"৩৮

কিন্তু তৃষার ইন্টারেস্ট ছিলো তার বাবার প্রিয় ছাত্র গুডবয় নির্মাল্যর প্রতি। " গুডবয় নির্মাল্যদা আড় চোখেও আমার দিকে তাকাত না। তাকালেও মনে হত আমি যেন একটা পোকামাকড়। টোকা মেরে ফেলে দেবে। এই অবহেলা, এই তুচ্ছ জ্ঞান আমার গা জ্বালিয়ে দিত। আমি ঠারেঠোরে ইঙ্গিত দিতাম। ওই বয়সে যতটা দেওয়া যায় আর কী ! চোখ ভাসিয়ে তাকাতাম, ঠোঁট কামড়ে হাসতাম। লাভ তো হতই না, বরং উলটো হত। গুডবয়ের চোখে ঘেন্না ফুটত।"৩৯

ফলে তৃষার মনে প্রতিশোধের আলো জ্বলতে থাকে - " আমার ভেতরের আলোটা হল প্রতিশোধের আলো, আমি সেই আলোটা নিয়ে বড় হতে শুরু করলাম।"৪০

তৃষা এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জমি দালালি করা ব্যাড বয় বিলুর সঙ্গে বিয়ে করে। তার পর নির্মাল্যর সঙ্গে প্ল্যান করে বিলুকে খুন করে। ফলে খুনের দায় নির্মাল্যর ঘাড়ে পরে। তখন তৃষা বলে - " গুডবয় আর ব্যাড গার্ল দু'জনেই আজ থেকে এক হয়ে গেলাম। দুজনেই খুনের আসামি, আমাদের কোনও ফারাক রইল না। এবার আমরা দু'জন দু'জনকে সমান ভাবে ভালবাসতে পারব। ভাল হল না ? আমার বহু দিনের ইচ্ছে ছিল, আমরা এক হয়ে যাব।"৪১

[সাত]

সভ্যতার সাথে সাথে প্রযুক্তি ও শিক্ষার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, ঠিক তেমনি আমাদের নারীদের অবস্থান ও বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। নারী হচ্ছে পৃথিবীর আলো, নারী হচ্ছে প্রকৃতির অপরিহার্য একটি অঙ্গ, যাকে ছাড়া গোটা বিশ্ব অচল। সভ্যতার অগ্রগতির মূলে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। যুগ যুগ ধরে পুরুষের পাশাপাশি নারীও সমান ভাবে অবদান রেখে আসছে। সর্বযুগেই নারী তার বুদ্ধি, মেধা, শ্রম, যোগ্যতা, মমতা দিয়ে ভবিষ্যৎ এর সাফল্য নিশ্চিত করে আসছে, সেই সাথে সৃষ্টি করে যাচ্ছে নতুন ইতিহাস। তবে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য নারীকে 'ধর্ষণ' করার প্রয়োজন হয় না। আর সংবাদপত্রে এমন বিজ্ঞাপন দেওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না –

"কলিতে MA 47 ডিভোর্সী ফর্সা সুশ্রী
রামকৃষ্ণ সারদা পূজারী একমাত্র মেয়ের
ঘরজামাই সপাত্র চাই।
সেক্সে অক্ষমও চলিবে।"

নতুন শতাব্দীতে নারীদের নিজস্ব সদ্-গুণরাশি এবং মূল্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠা অবশ্য কর্তব্য। যে বিবাহিত জীবনে স্ত্রী, স্বামীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রী হয়ে সংসারের সকল কর্তৃত্বভার গ্রহণ করতে পারেন, সেখানেই তার জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্মান, সেখানেই তার জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কারণ এই গৃহিণীর কর্তৃত্বেই তাকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার সন্তানদের লালনপালন এবং শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে তাদের মানুষ করার সুযোগ দিয়ে থাকে। অবশ্য একথাও সত্য যে, প্রত্যেকে নারীই শুধু মাত্র বিবাহিত জীবন যাপনেই তার সত্তাকে তৃপ্ত করার জন্য জন্মায়নি। যে নারীর জীবনের বিশেষ কোন আদর্শ থাকে, সেই নারীকে তার সেই বিশেষ গুণ ও কর্মগুলিকে বিকাশ করার মতো, তার উপযোগী সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত। তাহলেই সেই নারী মানবসেবার জন্য তার জীবনকে উৎসর্গ করতে সক্ষম হবে এবং এই মানবসেবার মাধ্যমেই নিজেকে দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

1. https://www.bartomanpratidin.com/মেয়েরা-পুরুষের-জুতা-ধোয়া/২৪ অগাষ্ট, ২০১৬, ১১:৩৬ am
2. সেনশাস্ত্রী মুরারি মোহন, অনূদিত 'মনুসংহিতা ', পৃ.- ৩৭৫।
3. চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার, চর্যাগীতি-র ভূমিকা, ডি. এম, লাইব্রেরি, কলকাতা, মার্চ ২০০৫, পৃ.-২১২।
4. সেন সুকুমার, (সম্পাদিত), কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, পৃ.- ৬০।

5. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০, পৃ.-৩৬০।
6. নাসরিন তসলিমা, নির্বাচিত কলাম, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ.-১১৮।
7. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবিত ও মৃত, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করন, মাঘ ১৪১৫, পৃ. ১০৩।
8. তদেবে, পৃ. ৬১৫।
9. চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী, প্রথম খন্ড, নারীর মূল্য, শুভম, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করন, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৭৯৪।
10. দেবী মহাশ্বেতা, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৭১।
11. ভট্টাচার্য সুচিত্রা, পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, এখন হৃদয়, সাহিত্যম, কলকাতা, ১২তম মুদ্রণ.নভেম্বের ২০১৪, পৃ.-৫৪
12. তদেবে, পৃ.-৫৬।
13. তদেবে, পৃ.-৬০।
14. নাসরিন তসলিমা, চার কন্যা, অপরপক্ষ, পার্ল পাবলিকেশেন্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.-৬৬।
15. নাসরিন তসলিমা, চার কন্যা, শোধ, পার্ল পাবলিকেশেন্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.-১৮১।
16. তদেবে, পৃষ্ঠা -১৮৫।
17. নাসরিন তসলিমা, চার কন্যা, ভ্রমর কইও গিয়া, পার্ল পাবলিকেশেন্স, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ.-২৭১।
18. নাসরিন তসলিমা, নির্বাচিত কলাম, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ.-১৩৫।
19. নাসরিন তসলিমা, নির্বাচিত কলাম, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ.-১৭৮।
20. গিরি সত্যবতী ও মজুমদার সমরেশ (সম্পাদিত) প্রবন্ধ সঞ্চায়ন, কৃষ্ণা বসু, কবিতায় নারী পৃথিবীর গান, রত্নাবলী, কলকাতা, জুলাই ২০১৩, পৃ.-২৩১।
21. শ্রীময়ী, নববর্ষ সংখ্যা ১৪২৩, বর্ণা অধিকারী, সে আমায় বুঝল না, পৃ.-১২৮।
22. পূষণ কবিতা পত্রিকা, শারদীয়া ও বইমেলা সংখ্যা, ২০১৬, পৃ.-৯৩।
23. সাহিত্য বিসারী, উৎসব সংখ্যা, ১৪২২, পৃ.-৭৭।
24. তবু একলব্য, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৪১৭, পৃ.-৩০৭।
25. দেশ ১৭ই অক্টোবর ২০১৩, গল্প সংখ্যক, পৃ.-৩৪।
26. তদেবে, পৃ.-৩৬।
27. তদেবে, পৃ.-৩৭।
28. দেশ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ.-২৮।
29. তদেবে, পৃ.-২৯।
30. 'দীপায়ন' পত্রিকা, সংখ্যা ৬, অক্টোবর - নভেম্বের, ২০১৫, বিশ্বজিৎ কর্মকার, 'চেকি' গল্প, পৃ.-৫৩।
31. সাহিত্য বিসারী পত্রিকা, উৎসব সংখ্যা, ১৪২২, সুকুমার রুজ, 'আগ্রাসন' গল্প, পৃ.-৯১।
32. এবেলা, পুজো সংখ্যা ২০১৬, পৃ.-১০৬।
33. তদেবে, পৃ.-১২৩।
34. তদেবে, পৃ.-১২৪।
35. তদেবে, পৃ.-১১৬।
36. তদেবে, পৃ.-১১৬ -১৭।
37. তদেবে, পৃ. -১২৭।
38. দেশ, ১৭ই মে ২০১৭, পৃ.-৩৮।
39. তদেবে।
40. তদেবে।
41. তদেবে, পৃ.-৪২।